THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
VOL. X, Annual Issue (2023) (ISSN: 2278-2699)

অসীম রায়ের 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র': জীবন বনাম রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়*

'সমাজ চিন্তার সঙ্গে যদি লেখকের আত্মজিজ্ঞাসা না থাকে তাহলে সমাজবাদ কেবল ডুবন্ত মানুষের খড়কুটো, কিম্বা কুয়োর ব্যাঙের আকাশ, তা মানুষের বিশাল সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের বাহন নয়।' [১] ভারতী পরিষদ সভায় পঠিত ও পুনর্লিখিত জবানবন্দী থেকে সাহিত্যের সত্য প্রকাশের এই তাগিদ থেকে সহজেই এ কথা ধারণা করা যায় যে কথাসাহিত্যিক অসীম রায় তাঁর বক্তব্যে সেই Social Establishment-এই বিশ্বাসী যেখানে তাঁর লেখকসত্তাটি সর্ব যান্ত্রিকতামুক্ত হয়ে এক সার্বভৌম অথচ সত্য বোধ ও বোধী সাপেক্ষ আত্মদৃষ্টির দ্বারা পরিচালিত হয়। হয়তো সকল সমাজ-সচেতন সাহিত্য-শিল্পীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এ কথা। জীবনের ক্যানভাসে সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে যাঁর লেখণী বিশেষতঃ গল্প-উপন্যাসের একটা বড় অংশ জুড়েই একসময় উঠে এসেছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন—তাঁর ***'অসংলগ্ন কাব্য'***-র অন্তর্বর্তী যে পরিবর্তমান বহির্জগৎ তাও আসলে এক অস্থির পথ-হাতড়ানো মানুষের অন্তর্জগতেরই ছবি। লেখকের কথানুসরণেই বলা যায়ঃ ***'নিজেকে বাহিরে টেনে এনেই আবার নিজেকে উলটে-পালটে দেখা—অন্তর ও বাহিরের মধ্যে অনেক সময় প্রায় এক অসম্ভব যোগসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা, শুধু কালের ডকুমেন্টারি নয়, নিজেকে সেই কালের নাট্যে ফেলে নিজেকেই আবার খুঁজে পাওয়া বিভিন্ন চরিত্রের মাঝখানে।'*** [২] —এই নিরবচ্ছিন্ন জীবন-ডায়েরী তুলে ধরারই ক্রমাগতঃ প্রয়াস করে গেছে তাঁর গল্প-উপন্যাস। এদিক থেকে তাঁর গল্প-উপন্যাস প্রকল্পগুলি সমকালীন অন্যান্য অনেকের থেকেই আলাদা। অনেকে এই অমিলের ফেরে কিম্বা নতুনত্বে শিল্পের বিপন্নতা খোঁজার চেষ্টা করেন। একদিকে বাস্তব জীবন-নাট্যের বিশাল ক্যানভাস ও অন্যদিকে সেই বাস্তব থেকেই লেখকের সংবেদনে উঠে আসা কাল্পনিক চরিত্রের ব্যঞ্জনাকে ন্যাচারালিজম এবং রিয়্যালিজমের মামুলি বিতর্কে ফেলেও জটিল করে তোলেন কেউ কেউ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লেখক অসীম রায়ের মতো জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী লেখকদের ক্ষেত্রে বাস্তবের প্রতিরূপ সাহিত্যে যা খুব বেশী করে উঠে আসে তার সাথে জীবন্ত বাস্তবকে মিলিয়ে নিতে বোধহয় খুব বেশী অসুবিধে হয় না। ব্যঞ্জনা, উপলব্ধি, অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া—এই শব্দগুলি যেমন লেখকের সহজাত তেমনি পাঠকেরও—যদিও মাত্রার নিজস্বতায় তারা ভিন্ন ভিন্ন। কখনো বা সমালোচনা ও বিচারের মাপকাঠিতে তারা আরোও পরিণত। একটি যুগ ও কালের চিহ্নবাহী অসীম রায়ের কথাসাহিত্য বিশেষতঃ তাঁর গল্পগুলি অনন্যস্বাদী এ কারণেও যে, সব মিলিয়ে তারা আমাদের সেই লক্ষ্যেই পৌঁছে দেয় যেখানে পাঠককে তার কোনো কষ্টকর ও অর্জিত কল্পনাশক্তি দিয়ে বাস্তবকে অনুভব করতে হয় না অথবা সমকালীন হয়েও শেষপর্যন্ত তা মানবিক অস্তিত্বের আবহমানতায় চিরকালীন রূপে ব্যঞ্জিত হয়ে যায়।

অসীম রায়ের লেখা ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'*** গল্পটির প্রেক্ষিত দেশভাগের পরবর্তী উত্তর কলকাতার দারিদ্র ও বঞ্চনার শিকার একটি নিম্নবিত্ত পরিবারে খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। বলাবাহুল্য, বঞ্চনার মাত্রাটি চাক্ষুষ অর্থে দারিদ্র হলেও আসলে তার মূলে আছে প্রবঞ্চনার রাজনীতি। এ রাজনৈতিক প্রবঞ্চনা দেশভাগের পর দেশত্যাগী অতি-নিম্নবিত্ত ও অসহায় মানুষদের প্রতি। রাজনৈতিক আদর্শবাদের পথভ্রষ্টতা এক বাঙালি যুবকের স্বপ্নকে কিভাবে ভেঙে চুরমার করে দেয় তা দেখতে পাই লেখকের ***'অনি'*** গল্পে। আর রাজনীতির পেশাদারিত্বময় কৌশলী খেলা কিভাবে সাধারণ, নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে বাধ্য করে Cannon Fodder হতে, তারই প্রতিচ্ছবি হলো ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'*** গল্পটি। শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এই তথাকথিত রাজনীতির পাকচক্রে সর্বথা কলুষিত হয়—স্বার্থ ফুরালে সুবিধাবাদী ও টেক্কা দেওয়ার রাজনীতি তার একদা আশ্রয় ও প্রশ্রয়ে থাকা গোলামকে অনায়াস দ্রুততায় পরিণত করে ***'শ্রেণীশত্রু'***-তে। বিপ্লবের নামে ভাইয়ের বুকে ভাইয়ের ছুরি বসাতে কাঁপে

* অধ্যক্ষ, খিদিরপুর কলেজ

না হাত। বাস্তব ঘটনা—যা একসময় সময়ের দলিলে পরিণত হয় তাকেই জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখি ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'*** গল্পে।

'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পটির সূচণা উত্তর কলকাতার কলোনির এক গরমের রাত। লেখক রচিত ***'গল্পসমগ্র'*** গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প ***'আরম্ভের রাত'*** (১৯৬৮) গল্পেও আমরা দেখি পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনীতির এক ক্রান্তিকাল দিয়ে সে গল্পের শুরু। এখানেও তাই। একটি রাতের ঘটনাবহুল দৃশ্যে ঘেরা এ গল্পের শুরুতে কলোনির বাসিন্দা ফেলুর মা'র দ্রুতপদে এগিয়ে এসে দরজা খুলে দেওয়া ও তারপরই নীল বুশ শার্ট ও খাকি প্যান্ট পরা বেণু নামের রোগা-ঢ্যাঙা ছেলেটির স্থির-শান্ত গলায় বলা—***'আমি ফেলুকে খুন করেছি। পুলিশে জানালে বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।'*** [৩]-কথায় গল্পে আকস্মিকতা আর নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়। এরপরই সে নাটকীয়তার আঁচ ছড়ায় ফেলুর বৃদ্ধা মায়ের ছোট ছেলে রতনকে উদ্দেশ্য করে বলা ***'আমার রক্ত যদি ত'র গায়ে থাকে তবে উয়ারে মার এহনই।'*** [৪]—কথা কয়টিতে। ভাষার গড়নে চিনে নেওয়া যায় দেশভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে উঠে আসা ছিন্নমূল এই পরিবারটিকে। রতনের দৃষ্টিতে ফেলু তার দাদা হলেও বেণু হলো কলোনি এলাকার মুকুটহীন রাজা। চোদ্দঘোড়া রিভলবার চালায় সে, অবলীলাক্রমে ছুটন্ত ট্যাক্সি থেকে পুলিশ অফিসারকে মেরে বছরের পর বছর পারে হাওয়ায় মিলিয়ে থাকতে, আর সে থানায় ঢুকলে থানা-অফিসার সুদ্ধ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—এলাকার ত্রাস সেই বেণুর বিরুদ্ধে বি.কম. পাশ ইস্কুলমাস্টার রতন কি করে রুখে দাঁড়াবে তা ভেবে পায় না। গল্পে দেখি, রতন ফেলুর বহু ব্যবহৃত আগ্নেয়াস্ত্রটি পায়ে বেঁধে বাড়ির বাইরে বের হয়। তার মনের গোপন প্রতিশোধস্পৃহাটি এখানে সুপ্ত ভাবে প্রকাশিত হলেও গল্পে তা বাস্তবায়িত হয়েছে নানা ঘটনা ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। গল্পে রতনের সাথে বেণুর প্রত্যক্ষত সংঘাতের আগে পুলিশের বড়বাবু অজিত দাস ও রাজনৈতিক নেতা অধীর চ্যাটার্জীর সাথে রতনের দীর্ঘ কথোপকথনে স্পষ্ট হয়েছে কীটদষ্ট সমাজের গভীর ক্ষতগুলি। বিশেষতঃ অজিত দাসের বলাঃ ***'আমরা ভাই ছা-পোষা মানুষ, খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই। বেণুকে অ্যারেস্ট করা কি আমার কাজ?'*** [৫] অথবা অধীর চ্যাটার্জীর বলাঃ ***'যারা বোমার সামনে বোমা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, দরকার হলে স্টেনগান চালাতে পারে তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওসব রাশিয়া, চীন সব দেশেই এক অবস্থা। অস্ত্র ধরনেওয়ালা লোক চাই।'*** [৬] উক্তিগুলিতে প্রশাসনের অপদার্থতা ও মার্কসীয় রাজনীতির অন্তঃসারশূণ্যতা ও তৎজনিত বিপজ্জনক ভবিষ্যতের ছবি আমাদের আতংকিত করে। সেইসঙ্গে দাদার হত্যাকারীর ধরা না পড়ার ঘটনা রতনের মধ্যে যে বিপন্নতাবোধের জন্ম দেয় তাও ক্রমে সংক্রামিত হয় পাঠকের মধ্যে। গল্পের শেষে দেখি, বেণুর পুনরাগমন এবং রতনের সাথে তার সরাসরি ও চূড়ান্ত প্রত্যাঘাতের ক্ষণটিকে। রামপ্রসাদের বাড়ির গায়ে রতন আবিষ্কার করে বুকে গুলি বেঁধা দাদা ফেলুর লাশ। লেখকের বর্ণনায়ঃ ***'রতন ফেলুর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। ফেলুর ঠোঁটের কোণে তার বাল্যকালের হাসি ফুটে উঠেছে, সেই যখন গুলি খেলার চোরামি করে সে মজা পেত। রতন তার বুকের ওপর মাথাটা রাখতে গিয়ে আবার ভোরের আকাশখানা দেখে। আর সেই ভোরের আকাশের একটা তারা। দাদা বলে আর একবার ডাকবার ইচ্ছা হয় তার।'*** [৭] এমনই ভাবনার মাঝে লজ্জাহীন বিদ্রুপের হাসি নিয়ে তার সামনে এসে হাজির হয় ঘাতক বেণু আর অবশেষে এতক্ষণ সঙ্গে রাখা ফেলুর আগ্নেয়াস্ত্রটি দিয়েই বেণুর প্রতি প্রত্যাঘাত হানতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রতন। গল্প এখানেই শেষ হয়।

গল্পের প্রেক্ষাপটটি দেশভাগ পরবর্তী বাংলার। লেখক অসীম রায়ের কথায়ঃ ***'দাঙ্গা আর দেশভাগের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মনে হয়েছিল তেমনি এই পরাক্রান্ত তাৎক্ষনিক জগতের সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা গেল যে ছোট ক্যানভ্যাসে, কবিতা কিম্বা খুচরো প্রবন্ধ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না, আমি তাহলে তলিয়ে যাব। গল্পেও আমাকে টানেনি কারণ গল্পেরও ক্যানভাস ছোট। আমি এখন একটা সমৃদ্ধ সমান্তরাল জগৎ চাই যা বছরের পর বছর আমাকে ধরে রাখবে। সচরাচর বাঙালি ঔপন্যাসিকের পরিক্রমা গল্প থেকে উপন্যাসে কিন্তু আমার পরিক্রমা ঠিক উলটো, কবিতা-উপন্যাস থেকে গল্পে।'*** [৮] বলাইবাহুল্য, তাঁর গল্পের পটভূমিতে দেশভাগ ও ছিন্নমূল পরিবারের জীবন-যন্ত্রনার ছবি বার বার উঠে এসেছে। কখনো বর্ণনায় আবার কখনো বা চরিত্র ভাবনায় এ ছবি ধরা পড়েছে। ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। এ গল্পে ফেলুর মার ভাবনায় দেশভাগের যন্ত্রণনাটি এমনঃ 'এতক্ষণ পর ফেলুর মা কাঁদতে বসেন। অন্ধকারে মেঝেয় বসে বিলাপ করেন। আর সেই ভাঙা বাঙাল বিলাপ শুধু ফেলুর জন্যে নয়, মূলত তাঁর শ্বশুরের ভিটের জন্যে। ষোলো-সতেরো***

বছর আগে হঠাৎ এক রাত্তিরে হুড়মুড় করে গহনা নৌকায় উঠে তাঁদের সেই পূর্ববাংলা থেকে চলে আসার দিন, শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকার দিন, তারপর এই উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে কাদায়, বৃষ্টিতে, হোগলার নীচে বছরের পর বছরের অস্তিত্ব—এইসব মিলেমিশে এই বিলাপ।[৯] এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণ শহরতলীতে যে পরিবারগুলি আশ্রয় পেয়েছিল, নিজেদের দারিদ্র আর বঞ্চনার কারণেই তাদের বেশীর ভাগটা হয়ে উঠেছিল তদানিন্তন বাম রাজনীতির প্রতি চরম আস্থাশীল। কিন্তু সমাজতন্ত্র অথবা বিপ্লবের নামে স্বার্থসিদ্ধির সেই ঝুটা রাজনীতি মরা আর বাঁচার লড়াই—এ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিল গুলি আর বোমা। সময়ে কাজে লাগানো অথবা অসময়ে *'শ্রেণীশত্রু'* চিহ্ন দেগে দেওয়া এই উদ্বাস্তু মানুষের দল যে রাজনীতিবিদদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিল গল্পের ঘটনা পরম্পরা তার প্রতি ইঙ্গিত দেয়। গল্পের রতন পুলিশের বড়কর্তা অজিত দাস কিম্বা বাম রাজনৈতিক নেতা অধীর চ্যাটার্জীর কাছে কোনো সহায়তাই পায়নি, তাই দাদার হত্যাকারীকে শাস্তি দেবার দায়টি শেষপর্যন্ত সে নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে। লেখক অসীম রায় তাঁর দীর্ঘ সাংবাদিকতার জীবনে রাজনীতির নানা অভিঘাতকে অতি কাছ থেকে দেখেছিলেন। যৌবনে মার্কসবাদ তাঁকে আকর্ষণ করলেও কখনোই তা তাঁকে মোহাচ্ছন্ন করেনি। তাঁর বুদ্ধিজীবী চেতনা সর্বদা মুক্ত চিন্তার আশ্রয়ে, সদর্থক ভাবনায় সমকালীন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার চুল-চেরা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছে। সর্বোপরি সাংবাদিকতা তাঁর পেশা হলেও সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় কমিটমেন্ট, সাহিত্যকে জীবনের মন্ত্র রূপে গ্রহণ করা, গল্পকে নিছক বিনোদন নয় বরং জীবনের কঠোর বাস্তবতা সমেত শক্তিশালী গল্প-মাধ্যমে তুলে ধরার প্রয়াসই সেখানে সবথেকে বড় বিষয় হয়ে উঠেছে।

দেশভাগ পরবর্তী ভঙ্গুর জীবনের ছবিটি রতনের ভাবনাতেও ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে ফুটে ওঠে। রতন ভাবেঃ *'এরপর পাঁচ-ছ'খানা টালির বাড়ি। এরা কিছু করতে পারল না। কুড়ি-বছর জিলিপি আর বাসি ছানার মিষ্টি করে কাটিয়ে গেল। কিন্তু এদের দু-তিনটে ছেলে ইতিমধ্যেই ফেলুর সাকরেদ হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে চোরাই সুপুরি আর চাল এলে সেগুলো ছেনতাই করতো। এ বিজনেসটা ভারত-পাক যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বেশ চালু ছিল। ট্রেন থেকে মেয়েদের দল যখন মাল পাচারে ব্যস্ত, তখন তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমনের নেতা ছিল ফেলু। তারপর ব্যবসাটা একদম ফেল পড়ে গেল। ফেলু ভিড়ল বেণুর দলে।'*[১০] এ বর্ণনায় দেশত্যাগী নিম্নবিত্ত মানুষগুলির ভ্রান্তি ও বিপথগামিতার ছবিটি অত্যন্ত স্পষ্ট। অসামাজিক কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকা, জীবনের ক্ষুন্নিবৃত্তি আর রাজনৈতিক অসততার চিত্র তখন বঙ্গ-রাজনীতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে। জবরদখল আর ওয়াগন ভাঙার ট্রেনিং দিয়ে জীবন শুরু করা ফেলুর দল যে গুণিতক হারে বেড়ে উঠছিল তা বোঝা যায় থানার বড়বাবু অজিত দাসের কথাসূত্রেও। সাপ, মশা আর পাঁকে ভরা কলোনির অস্বাস্থ্যকর আর বিষাক্ত পরিবেশে ক্রাইমের ভারে ছোট থেকে দাগী আসামীদের নাম একদিকে যেমন প্রায় প্রতিদিন পুলিশের খাতায় জ্বল্ জ্বল্ করে ওঠে তেমনি অন্যদিকে বড়, মেজ, সেজো রাজনৈতিক দাদারা তাদের একচেটিয়া কায়েমি স্বার্থে কাজে লাগিয়ে চলে এদের। টাকা আর নারীর দখল নিয়ে বেপরোয়া জীবনের পাশে জমে থাকে অভাব, বঞ্চনা, গোপন হিংসা আর প্রতিহিংসার টুকরো টুকরো ছবি! চাকরীর অভাব, ব্যবসার অভাব, রাস্তার অভাব, আলোর অভাব—'নেই'-এর তালিকাটা ক্রমে দীর্ঘ হতে থাকে। একদিকে পুত্রহারা ফেলুর মা'য়ের বুক-চাপা কান্না কলোনির রুদ্ধশ্বাস বাতাসকে ভারী করে তোলে আর অন্যদিকে বেণুরা দারোগা থেকে মিনিস্টার সকলের চোখে হয়ে ওঠে ক্ষণজন্মা পুরুষ। অজিত দাসের বয়ানে শোনা যায়ঃ *'এ অঞ্চলে যেখানেই যাবে সেখানেই বেণু। এই থানায় বসে বসে মাঝরাতে সেই বেণুধ্বনি শুনছি আর কাঁপছি।'*[১১] রতনের চোখে উদ্বাস্তু জীবনের ছবি আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে গল্পের শেষ পাদে। গল্পকারের ভাষায়ঃ *'রতন নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢোকে। মা একবার ফিরেও তাকান না। বোধহয় বসে বসে ঘুমোচ্ছেন। সেদিকে চেয়ে চেয়ে তাদের প্রথম কলকাত আগমনের দিনটা মনে পড়ে রতনের। শেয়ালদা স্টেশনে মানুষের পুঁটলি। চারদিক ভেজা, নাকপোড়া ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। রিফিউজিদের মধ্যে বসন্ত লেগেছে। মস্ত বড় করে লাল শালুতে লেখা, 'বসন্তের টিকা নিন'*। তার মধ্যেই তারা কুঁকড়ে শুয়েছিল পুরো দশ-বারোটা দিন। *'হাটকে হাটকে' বলে ক্রমান্বয়ে কুলিদের হাঁক আর অহর্নিশি পদধ্বনি। প্রথম তিন-চারটে রাত্তির রতন ঘুমাতে পারে নি। মাঝে মাঝে গায়ে টর্চ পড়েছে। চোরাই মালের জন্যে স্টেশনের এধার-ওধার খানাল্লাসি চলেছে।'*[১২] এ দৃশ্য থেকেও উদ্বাস্তু জীবনের ছবি

প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে। দেশভাগের ফলে নিম্নবিত্ত মানুষের পেশাগত পরিবর্তনের ছবি ধরা পড়ে লেখকের সেই বর্ণনায় যেখানে তিনি বলেনঃ ***'কিন্তু এদের দু-তিনটে ছেলে ইতিমধ্যেই ফেলুর সাকরেদ হয়েছিল। পাকিস্তান থেকে চোরাই সুপুরি আর চাল এলে সেগুলো ছেনতাই করতো। এ বিজনেসটা ভারত-পাক যুদ্ধের আগে পর্যন্ত বেশ চালু ছিল। ট্রেন থেকে মেয়েদের দল যখন মাল পাচারে ব্যস্ত, তখন তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমনের নেতা ছিল ফেলু। তারপর ব্যবসাটা একদম ফেল পড়ে গেল। ফেলু ভিড়ল বেণুর দলে।'*** [১৩] আমাদের সমাজে ক্রিমিন্যাল কিভাবে তৈরী হয় এর থেকে বড় ও স্পষ্ট উদাহরণ বোধ হয় আর কিছু হয়না।

'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পটির গঠন-প্রকৃতির বিচারে প্রথমেই যে কথাটি উঠে আসে তা হলো এ গল্পে আধুনিক ছোটগল্প সুলভ এক তীব্র গতিময়তা ও নাটকীয়তার বাতাবরণ রয়েছে যা গল্পের সূচণা পর্ব থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। লেখক অসীম রায়ের কথায়ঃ ***'দাঙ্গা আর দেশভাগের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন মনে হয়েছিল তেমনি এই পরাক্রান্ত তাৎক্ষনিক জগতের সামনে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করা গেল যে ছোট ক্যানভ্যাসে, কবিতা কিম্বা খুচরো প্রবন্ধ আমাকে ধরে রাখতে পারবে না, আমি তাহলে তলিয়ে যাব। গল্পেও আমাকে টানেনি কারণ গল্পেরও ক্যানভাস ছোট। আমি এখন একটা সমৃদ্ধ সমান্তরাল জগৎ চাই যা বছরের পর বছর আমাকে ধরে রাখবে। সচরাচর বাঙালি ঔপন্যাসিকের পরিক্রমা গল্প থেকে উপন্যাসে কিন্তু আমার পরিক্রমা ঠিক উলটো, কবিতা-উপন্যাস থেকে গল্পে।'*** [১৪] তাঁর বক্তব্য যেমনই হোক না কেন, আমরা দেখি ছোট এই ক্যানভাসেই বড়ো জীবনকে সার্থকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চিরকাল করে গেছেন তিনি। ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'*** গল্পটিও তার ব্যতিক্রম নয়। একটি খুনের ঘটনা দিয়ে গল্প শুরু হওয়ায় উৎকণ্ঠার পরিবেশটি প্রথম থেকেই ঘনীভূত হয়েছে। ছোট ছোট অনুচ্ছেদে পরিবেশ ও চরিত্রের স্ফূরণ ঘটেছে গল্পের গঠন-বয়নে। পারিবারিক বাতাবরণ থেকে ক্রমশঃ বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে গল্পের উত্তরণে চরিত্র ও ঘটনার গতি-প্রকৃতিও অত্যন্ত বিষয়ানুগ। চরিত্রের প্রকৃতিটিও কালের স্বভাবানুগ। রাজনৈতিক গল্প হওয়ায় রাজনৈতিক বাতাবরণটি গল্পের গঠন প্রকৃতিতে সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। গল্পের অন্তর্নিহিত ছোট ছোট ব্যঞ্জনাগুলিও রাজনৈতিক চিহ্নায়নে ভাস্বর। রতন নামক চরিত্রটির নানা উত্থান-পতন সহ ক্লাইম্যাক্স অংশে রতনের ভূমিকাটিকে গল্পের স্বাভাবিক পরিণতি বলেই মনে হয়। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল একটি পরিবারের অস্বাভাবিক পরিণতির পাশাপাশি উত্তর কলকাতার কলোনির দমবন্ধ করা পরিবেশ এ গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ফেলুর মা'র ভাবনায়ঃ ***'এতক্ষণ পর ফেলুর মা কাঁদতে বসেন। অন্ধকারে মেঝেয় বসে বিলাপ করেন। আর সেই ভাঙা বাঙাল বিলাপ শুধু ফেলুর জন্যে নয়, মূলত তাঁর শ্বশুরের ভিটের জন্যে। ষোলো-সতেরো বছর আগে হঠাৎ এক রাত্তিরে হুড়মুড় করে গহনা নৌকায় উঠে তাঁদের সেই পূর্ববাংলা থেকে চলে আসার দিন, শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকার দিন, তারপর এই উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে কাদায়, বৃষ্টিতে, হোগলার নীচে বছরের পর বছরের অস্তিত্ব—এইসব মিলেমিশে এই বিলাপ।'*** [১৫] বিলাপের কারণ দুই পরিবেশের (দেশভাগ আর স্বজনবিয়োগ) বিপন্ন যন্ত্রনাকে একসাথে মিলিয়ে দেয়। কলোনির মেয়ে দীপ্তিকে নিয়ে গণ্ডগোলের জেরেই হয়তো ফেলুকে খুন হতে হয়েছে। রতনের ভাবনায় কলোনির পরিবেশ এক বিষাক্ত, ক্লেদাক্ত ও মৃত্যু-শীতল অনুভূতি নিয়ে ধরা দেয় যখন লেখক বলেনঃ ***'দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো গরমের হাওয়া উঠে আসে। আর তার সঙ্গে ধূলো। পাক খেতে খেতে শুকনো পাঁক মেশানো ধূলো রতনের নাকে মুখে ঝাপটা দেয়। এরপর একটা আধবোজা পুকুরের সহসা উপস্থিতি। সেই বেনোজলে চাঁদের আলো দেখে বুকের ভেতরটা রতনের একবার শিরশির করে ওঠে। জল ছেঁচলে বোধহয় দুটো মানুষের কঙ্কাল এখনও বেরোতে পারে। এরপর পাঁচ-ছখানা টালির বাড়ি। এরা কিছু করতে পারল না। কুড়ি-বছর জিলিপি আর বাসি ছানার মিষ্টি করে কাটিয়ে গেল।'*** [১৬] এ বর্ণনা কলোনির পরিবেশ ও ঐ পরিবেশে অভ্যস্ত মানুষের চেনা প্রকৃতি সমেত গল্পে উঠে আসে। খুনের ঘটনার পাশাপাশি গোটা গল্প জুড়েই এক অজানা ভয় ও মৃত্যুর হিমার্ত অনুভূতি লুকিয়ে আছে। রাত্রির অন্ধকার তাতে এক বিশেষ মাত্রা যুগিয়েছে। লেখকের বর্ণনায়ঃ ***'রতন ফেরে। সরু কাঁচা শুকনো কাদায় অসমান গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পাশের কলোনিতে পড়ে। আবার বড় রাস্তা। গ্যারাজমুখী খালি বাস বেরিয়ে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডাকতে ডাকতে থামে। রতন রাস্তা পেরোয়। পেরিয়েই বন্ধ মাংসের দোকান। দোকানের পাশে ঘাসের এক কোণে***

পাঁঠার রক্ত কালচে হয়ে জমে আছে। রিকশা স্ট্যান্ডে এখনও সবাই ঘুমোয় নি। গাঁজার কলকে হাতে গোল হয়ে কয়েকটা মানুষ। একটা মিশমিশে কালো ঢ্যাঙা লোক কলকেতে সজোরে টান দেওয়ায় তার মুখের এক পাশ আলো হয়ে ওঠে। সেই আলোকিত গালের দিকে সাবধানে এক নজর তাকায় রতন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হাঁটতে হাঁটতে পিঠ ঘেমে গেছে।' [১৭] এ বর্ণনার ব্যঞ্জনাতে অন্ধকার, শূণ্যতা, হতাশা আর অজানা ভয় মিলে-মিশে আছে।

'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পটির শ্রেণী বিচারে আমরা অবশ্যই একে রাজনৈতিক গল্পের শ্রেণীতে রাখতে পারি। এ গল্পের পরিধি যদি উদ্বাস্তুর জীবন-যন্ত্রনার কথাচিত্র হয় তবে অবশ্যই এর কেন্দ্র জুড়ে রয়েছে সমকালীন দূষিত রাজনীতির বাতাবরণ। কেন্দ্রের আকর্ষণে পরিধি জুড়ে ঘূর্ণমান জীবনের ছবিটি এখানে খুব স্পষ্ট মাত্রায় ধরা দিয়েছে। ভীতি এবং বদান্যতার এই রাজনীতি একদিকে যেমন অজিত দাসের মতো প্রশাসনিক ব্যক্তিত্বকে ধীরে ধীরে নপুংসক করে তোলে, অন্যদিকে তেমনি অধীর চ্যাটার্জীর মতো রাজনৈতিক নেতাদের লাগামহীন প্রশ্রয়ে অবস্থা পৌঁছায় এক ভয়ংকর পর্যায়ে। গল্পের চরিত্রগুলির বিভিন্ন সংলাপের মধ্যে দিয়ে সমকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণটির প্রকাশ সহজেই চোখে পড়ে। অজিত দাসের কথায়ঃ ***'আমি শিকদার নই ভাই। শিকদার জানো তো? কানুর গুলিতে মরল। তারপর মরার পর মেডেল পেল। আমি ভাই মরার পর মেডেল পেতে চাই না। শিকদারের দুই ছেলের কী হয়েছে জানো? পুলিশ অফিসারের ছেলে। ওয়াগন ভাঙার ট্রেনিং পায়নি। এ অঞ্চলে যদি থাকত, তোমার দাদার দলে ভিড়ে যেত। আমরা ভাই ছাপোষা মানুষ, খেয়ে পরে বাঁচতে চাই। বেণুকে অ্যারেস্ট করা কি আমার কাজ? বেণুকে কে পারে অ্যারেস্ট করতে? মিনিস্টারে পারে? স্বয়ং ভগবানও পারবে না। ওরা ক্ষণজন্মা পুরুষ। এ অঞ্চলে যেখানেই যাবে সেখানেই বেণু। এই থানায় বসে বসে মাঝরাতে সেই বেণুধ্বনি শুনছি আর কাঁপছি।'*** [১৮] এ উক্তিতে স্পষ্ট হয় এলাকার রাজা আসলে বেণুরাই। সমস্ত প্রশাসন তাদের হাতে। আর তথাকথিত এই গুণ্ডাদেরই সেলাম বাজান অজিত দাসের মতো পুলিশের বড়বাবুরা। নেতা অধীর চ্যাটার্জীর বক্তব্যে রাজনীতির এ পাপ-পঙ্কটি আরও গভীর। অসুখ অনেক গভীরে এবং চিকিৎসাও দূরস্থ। রতন যখন অধীরকে ***'বেণুর হাতের পুতুল'*** বলে উপহাস করে তখন অধীর চ্যাটার্জী রেগে যান। রতন চুপ করে থাকে। রতন জানে জল-কাদায় বনে-বাদাড়ে তাদের লাঠি হাতে দাঁড়াতে শিখিয়েছে অধীরের মতো নেতারাই। বাঁশ আর দরমা বেঁধে তারা একদিকে যখন গড়ে তুলেছে উদ্বাস্তু কলোনি আর অন্যদিকে অধীরের দল ক্রমে কলোনির বাসিন্দাদের বানিয়ে তুলেছে তার কেনা গোলাম। অধীর চ্যাটার্জীর বরাভয় হস্ত প্রসারণে আদায় হয়ে চলেছে সরকার থেকে গৃহঋণ আর স্কুলের গ্রান্ট। সেইসঙ্গে বেণুকে গুণ্ডা বানিয়ে কানুর (যে-ও এক গুণ্ডা) প্রতিপক্ষ রূপে তাকে গড়ে তোলা ও নিজের কার্যসিদ্ধি করা—এসবের মূলেও তিনি। অবশেষে তার বলাঃ ***'তাহলে ব্যাপারটা বলি, শোনো। আমরা যাই করি না কেন, এসেমব্লি করি, ময়দান মিটিং করি, সব সময় আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আর অস্ত্র কারা ব্যবহার করবে? কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্যিক? যারা বোমার সামনে বোমা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, দরকার হলে স্টেনগান চালাতে পারে, তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওসব রাশিয়া, চিন সব দেশেই এক অবস্থা। অস্ত্র-ধরনেওয়ালা লোক চাই।'*** [১৯] এ উক্তির মধ্যে দিয়ে অধীর চ্যাটার্জীর মতো সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের আসল চরিত্রটি প্রকাশ পায়। বেণু, ফেলু এমনকি রতনও যে তাদের রাজনৈতিক পাশা খেলার ঘুঁটি মাত্র সেটাও বোঝা যায় এ উক্তির অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনাটুকু থেকে। পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ অধীর চ্যাটার্জীর এ উক্তির সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায় ***'আরম্ভের রাত'*** (১৯৬৮) গল্পের প্রৌঢ় কমিউনিস্ট পানুদার উক্তিটিকে যেখানে তিনি বলেনঃ ***'ইলেকশান আর সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা এক ব্যাপার নয়। ইলেকশানে বিপ্লব নাই। আছে অনেক রকম ফিকির। সেইসব ফিকির আয়ত্ত না করতে পারলে জেতা যায় না।'*** [২০] অন্যদিকে, রতনের অস্থিরতা, ডুকরিয়ে ওঠা, অসহায়তা অথবা অধীর চ্যাটার্জীর গোপন দীর্ঘনিঃশ্বাসের মধ্যে থেকেও একটা জীবনসত্য উঠে আসে অধীরের কথাসূত্রে, আর তা হলোঃ ***'যেদিন লোকের চেতনা আরও বাড়বে, সেদিন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'*** [২১] কিন্তু জনচেতনার এ বাস্তবায়ন যে কবে হবে তা কেউ জানে না। তবুও এ কথাটি রতনের চিন্তায় উঠে আসে বারংবার। হয়তো রাজনীতি আর জীবন এ দুয়ের মাঝের প্রকৃত সত্য আসলে এটাই।

'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পের অন্যতম চরিত্রটি হলো পুলিশের বড়বাবু অজিত দাস। চরিত্রটিকে শোষক অথবা শোষকের বশংবদ চরিত্র বলা যেতে পারে। তার কুচকুচে কালো ও দীঘল, পেশীবহুল চেহারা। হাতে ও ঘাড়ে অতীতের ব্যায়ামচর্চার ইঙ্গিত স্পষ্ট। রাত্রি দেড়টার সময় থানাগৃহে রতনের আগমন ও স্বয়ং নিজেকে খুনি রূপে স্বীকার করা বেণুর বিরুদ্ধে কেস-ডায়েরী করতে চাওয়া রতনের বক্তব্য শুনেও তার মধ্যে কোনো হেল-দোল দেখা যায়নি। এ থেকেই বোঝা যায়, এই সিস্টেমের মধ্যে থাকতেই বরাবর অভ্যস্ত তিনি। খুনির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক উল্টে তিনি গুণ্ডা বেণুর হয়েই নানা সাফাই গাইতে থাকেন। গুণ্ডামির ক্ষমতায় কানু অথবা বেণু যারই রাজত্ব চলুক না কেন অজিত দাসের মতো পুলিশের বড় কর্তারা নিমেষে তাদের গোলাম বনে যান। অজিত দাসের কথায় কলোনির ক্রাইমের যে ইতিহাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেখানেও আছে প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। অজিত দাসের কথায়ঃ ***'এক-একটা কলোনিতে পাঁচ ছয় সাত হাজার লোক, এরা যখন এল তখন শুরুই করল তাদের জীবন জবর-দখল দিয়ে, বুঝলে? চাকরি নেই, ব্যবসা নেই, রাস্তা নেই, আলো নেই। সাপ, মশা, পাঁক। এখানে যদি ক্রাইম না হবে, কোথায় হবে? তার ওপর ঘরে ঘরে সোমত্থ মেয়ে—সবাই এক-একটা বোমা। আরে ফেলুও তো মরল ওই তোমাদের বাড়ির পাশের দীপ্তি দাসকে নিয়ে। মাঃ আর কতো দেখব। শেষ বাক্যটা এবার বিশাল হাইয়ে তলিয়ে যায়।'***[২২] তবে অজিত দাসের কথায় আর একটা গভীর সত্যও চোখে পড়ে। প্রকাশ্যে খুন করে বেড়ানো খুনির বিরুদ্ধে কলোনির লোকেরা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে ভয় পায়। এ বিষয়ে রতনের কাছে অধীর প্রশ্ন রাখলেও রতন থাকে নিরুত্তর। বেণুর মতো অসামাজিক খুনিদের বিরুদ্ধে ভয় শুধু প্রশাসনেরই নয় বরং তা যে ছেয়ে আছে রতন সহ কলোনির অন্যান্য মানুষের মনেও তা বুঝে নিতে এতটুকু অসুবিধে বোধ হয়না। অধীর চ্যাটার্জীর চরিত্রটি এক কেউকেটা রাজনীতিকের। গল্পের অধীর চ্যাটার্জী চরিত্রটি এক টিপিক্যাল রাজনৈতিক চরিত্র। ষাটের দশকের বাম জমানা থেকে শুরু করে সত্তরের নকশাল আন্দোলন পর্যন্ত এমন নেতাদের দেখা পাওয়াটা খুবই সুলভ ছিল। বছর পঁচান্নর বাম নেতা অধীর চ্যাটার্জীর পরনে লুঙ্গী ও সাদা গেঞ্জী। গেঞ্জীর ওপরে উঁচিয়ে আছে কণ্ঠার হাড়। চশমা ছাড়া বলে চোখ দুটো ঘোলাটে ও দৃষ্টিহীন। তার নিরাভরন ঘরে লেনিনের ছবি। কাচা সাদা শার্ট ও ধুতি দেওয়ালে টাঙানো। কৃতদার অধীর চ্যাটার্জীর গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি। জ্বলজ্বলে চোখ দুটি অনুসন্ধানী। খুনি জেনেও বেণুকে তিনি আড়াল করতে চান তার স্পষ্ট কারণ পার্টির স্বার্থে বেণুকে তার দরকার। রতন যখন ঘৃণাভরে বলেঃ ***'তাহলে কাগজে কাগজে যা লেখে আমাদের পার্টি গুণ্ডা পোষে তাই ঠিক?'***[২৩] তখন অধীর বলে ওঠেঃ ***'কাগজে আমি পেচ্ছাপ করি। আমাকে এত রাতে উত্তেজিত কোরো না রতন। তাহলে ব্যাপারটা বলি, শোনো। আমরা যাই করি না কেন, এসেমব্লি করি, ময়দান মিটিং করি, সব সময় আমাদরে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আর অস্ত্র কারা ব্যবহার করবে ?কলেজের অধ্যাপক, সাহিত্যিক? যারা বোমার সামনে বোমা নিয়ে দাঁড়াতে পারে, দরকার হলে স্টেনগান চালাতে পারে, তাদের ওপর নির্ভর করতে হবে। ওসব রাশিয়া, চিন সব দেশেই এক অবস্থা। অস্ত্র-ধরনেওয়ালা লোক চাই।'***[২৪] অধীরের এ ভাষা আদ্যন্ত রাজনৈতিক। কাঁচা গালাগাল সহ বলা সে সব উক্তিতে তাদের রক্ষক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায় রিভলবরধারী বেণুরা। অথচ কত স্বাভাবিকভাবে না এই অধীর চ্যাটার্জীর কণ্ঠ থেকেই বেরিয়ে এসেছে সেই সহজ সত্যটি যার সাথে কোনো রাজনীতির রং মেলে না। লেখকের ভাষায়ঃ ***'আর একটা বিড়ির ডগায় ফুঁ দিতে দিতে হঠাৎ থেমে যান অধীরদা। ধীরে ধীরে বলেনঃ 'আছে। যেদিন লোকের চেতনা আরও বাড়বে, সেদিন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'***[২৫] কত আশ্চর্যভাবেই না সহজ এই জীবন-সত্যগুলি আচমকাই বেরিয়ে আসে দুর্বৃত্তায়নের রাজনৈতিক ঘেরাটোপ থেকে। অধীর চ্যাটার্জীর বলা এই উক্তিটিও তেমন যা গল্পের রতনের ভাবনায় ক্রমে অন্য এক মাত্রা পেয়ে যায়। রতন এ গল্পের অন্যতম মুখ্য চরিত্র। তার ভাবনার মধ্যে দিয়েই প্রধানতঃ গল্পের অন্তর্নিহিত ব্যাখ্যা ও ব্যঞ্জনাগুলি উঠে এসেছে। এ গল্পে সে স্বজনহারা। দাদা ফেলুর হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে চাওয়া দিশেহারা রতন ছুটে বেরিয়েছে থানার বড়বাবু অজিত দাস থেকে পলিটিক্যাল নেতা অধীর চ্যাটার্জী পর্যন্ত। রতনের এ ভূমিকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও বাস্তবোচিত। গল্পের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহও জ্বলন্ত বাস্তবের উদাহরণ। জনপদের সঙ্গে এত মিডল স্কুলকে মেলাতে পারেনা বি.কম. পাশ শিক্ষক রতন। শিক্ষিত হওয়া আর বেকারত্বের ফলশ্রুতি স্বরূপ ওয়াগন ভাঙার স্বতঃসিদ্ধ দুই বাস্তবকে মেলাতে পারেনা সে। কলোনি-জীবনের পরিবেশে এদেরকে কখনো কখনো তার এক আর অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়। কখনও তাদের রিফিউজি জীবনের স্মৃতি তাকে আচ্ছন্ন করে। দাদা ফেলুর সুস্থভাবে বেঁচে থাকার

চেষ্টা, গড়ে তোলা চা'য়ের দোকানের ছোট-খাটো ঘটনা, দাদার সংসার পাতার ইচ্ছে থেকে শুরু করে দাদার কাছে ছুরি খেলা শেখার ভাবনাগুলি কলোনির শিক্ষিত ছেলেটিকে বারে বারে কাতর করে। অবশেষে হলদে-রঙা পাঁচিলের গায়ে মানকচুর কালচে সবুজ ও সতেজ ঝোপে, চেটালো পাতার গালিচায় সে আবিস্কার করে নিহত ফেলুর দেহ। নিথর দেহটির সাদা শার্টের ওপর চোখে পড়ে কালচে রঙের রক্তের দুটি বৃত্ত। এরপরই গল্পের নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সটি সূচিত হয়। অকস্মাৎ সেখানে বিদ্রুপের হাসি হেসে হাজির হয় স্বয়ং বেণু। দাদার বুকে মাথা রাখা রতন দেখতে পায় ভোরের আকাশে জেগে ওঠা তারাটিকে। হয়তো তার ক্ষীণ আলো আশার মতো উঁকি দিয়ে এক নতুন সকালের প্রতি ইশারা করে। রতন তার পায়ে গোঁজা রিভলবারের কাঠের বাঁটখানি শক্ত করে চেপে ধরে আর তারপরই প্রত্যাঘাতের উদ্দেশ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেণুর উপর। নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়া এক নিরুপায় মানুষ হিসাবে শেষপর্যন্ত গল্পে রতনকে দেখি আমরা, সমকালীন রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে যা অত্যন্ত বাস্তব বলে মনে হয়। দেশভাগ ও তার ফলাফলের প্রভাব সব থেকে বেশী করে চোখে পড়ে ফেলুর মা চরিত্রটিতে। জরা ও ব্যাধির পাশাপাশি জীবনের সমস্যায় জর্জরিত ফেলুর মার অসহায় করুণ অস্তিত্বটি গল্পের প্রথমেই দেখতে পাই। সে রাতকানা। বয়সের ভারে ন্যুব্জ। ফেলুর সাথে তার কথোপকথনের পুরো অংশটাই বাঙ্গাল ভাষায়। এতেই বোঝা যায়, আদতে এরা ও-বঙ্গের। শরীরে দুর্বল হলেও মনের দিক থেকে ফেলুর মা যে এখনও শক্ত তা বোঝা যায় সরাসরি খুনি বেণুর মুখে ফেলুর খুনের কথা শুনেও তার অবিচলতা ও দৃঢ়চিত্ততায়। ছোট ছেলে রতনকে তার দাদার খুনের প্রতিশোধ নিতে উত্তেজিত করেন তিনি। এরপর অবশ্য পুত্রশোক ও ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে নিজের বিলাপ চেপে রাখতে পারেন না তিনি। লেখকের ভাষায়ঃ ***'এতক্ষণ পর ফেলুর মা কাঁদতে বসেন। অন্ধকারে*** মেঝেয় বসে বিলাপ করেন। আর সেই ভাঙা বাঙাল বিলাপ শুধু ফেলুর জন্যে নয়, মূলত তাঁর শ্বশুরের ভিটের জন্যে। ষোলো-সতেরো বছর আগে হঠাৎ এক রাত্তিরে হুড়মুড় করে গহনা নৌকায় উঠে তাঁদের সেই পূর্ববাংলা থেকে চলে আসার দিন, শেয়ালদা স্টেশনে পড়ে থাকার দিন, তারপর এই উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে কাদায়, বৃষ্টিতে, হোগলার নীচে বছরের পর বছরের অস্তিত্ব—এইসব মিলেমিশে এই বিলাপ।'[২৬] ঘন্টাখানেক বিলাপের পর তিনি আবার মনের দিক থেকে শক্ত হয়ে ওঠেন। রতনকে 'মাইয়ালোক' বলে গালি পেড়ে মেঝেতে লাথি মারেন। কলোনির নিত্যদিনের অভাব আর নানাবিধ সমস্যায় আকীর্ণ এক অসহায় বৃদ্ধা রূপে এ গল্পে ফেলুর মা চরিত্রটির বাস্তবায়ন ঘটেছে।

গল্পের পারিবেশিক বর্ণনায় উত্তর কলকাতার কলোনির বিষাক্ত ও ভীতিপ্রদ পরিবেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি দেশভাগের পর শিয়ালদা স্টেশনে ভিড় করা শরনার্থীদের নারকীয় পরিবেশটিও গল্পে উঠে এসেছে। কলোনির পরিবেশের কিছুটা লেখকের ভাষায় এমনঃ ***'রতন দাঁড়িয়ে পড়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়। কাছে-পিঠেই মদ চোলাইয়ের গোপন কারখানা। কাজ পুরোদমে চলছে। রতন লক্ষ্যভ্রষ্টের মতো হাঁটতে থাকে পাশের কলোনি দিয়ে। খেয়াল নেই একটা গলি ভুল করে তাদের ইস্কুলের গলিতে এসে পড়েছে। লম্বা টিনের চালের শূণ্য দাওয়ায় অন্ধকার খাঁ খাঁ করে। পা ধরে গেছে রতনের। অন্ধকার দাওয়ায় এসে বসতেই একটা সাদা পাটকিলে বড় দিশি কুকুর তার কাছে এসে লেজ নাড়াতে থাকে। রতন অন্যমনস্কভাবে তাদের ইস্কুলের ভুলুয়া কুকুরটার মাথায় হাত বোলায়। কাল সকালেই ক্লাস ফাইভের অঙ্কের পিরিয়ড। বত্রিশ প্রশ্নমালার ঐকিক নিয়মের অঙ্ক। রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে ওঠে।'*** [২৭]এ বর্ণনায় প্রথমে রতনের ***'জোরে জোরে নিঃশ্বাস'*** নেওয়া ও শেষে ***'দীর্ঘশ্বাস'*** ফেলা উভয়ের মধ্যে দিয়েই কলোনির চিরকালীন বঞ্চনা ও পুঞ্জিভূত হতাশার ছবিটি চোখে পড়ে। রতনের এমন দীর্ঘশ্বাসের কথা গল্পে অনেকবার এসেছে যা গল্পের অবয়বে এক ব্যর্থতা, হতাশা আর বেদনার দ্যোতনা বহন করে চলে। বলাবাহুল্য গল্পের 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' নামকরণটি এ কারণেও অনেকাংশে তাৎপর্যপূর্ণ। এরই পাশাপাশি দেশভাগের পর দেশ ছেড়ে আসা উদ্বাস্তু পরিবারগুলি যখন স্থায়ী কিম্বা অস্থায়ী ঠিকানার উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে পাড়ি জমায় তখনকার বর্ণনা লেখকের ভাষায়ঃ ***'শেয়ালদা স্টেশনে মানুষের পুঁটলি। চারদিক ভেজা, নাকপোড়া ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ। রিফিউজিদের মধ্যে বসন্ত লেগেছে। মস্ত বড় করে লাল শালুতে লেখা, 'বসন্তের টিকা নিন'। তার মধ্যেই তারা কুঁকড়ে শুয়েছিল পুরো দশ-বারোটা দিন। 'হাটকে হাটকে' বলে ক্রমান্বয়ে কুলিদের হাঁক আর অহর্নিশি পদধ্বনি। প্রথম তিন-চারটে রাত্তির রতন ঘুমাতে পারে নি। মাঝে মাঝে গায়ে টর্চ পড়েছে। চোরাই মালের জন্যে স্টেশনের***

এধার-ওধার খানাল্লাসি চলেছে। তখন বুঝতে পারেনি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে শুনেছিল একটা কমবয়সি মেয়েকে নিয়ে হৈ-হৈ। একজন বৃদ্ধ চেঁচাচ্ছে, ও মাগী আমার মেয়ে না।'[২৮] নারকীয়তার জীবন্ত প্রমাণ এ চিত্রটিও সমকালীন বাস্তব থেকেই তুলে আনা। পরবর্তী বর্ণনায় পরিবর্তিত স্বভাবে চিহ্নিত ফেলুর গুলি খেলার চোট্টামি, ইয়ার-বন্ধুদের সাথে ফেলুর দোস্তি অথবা গুণ্ডামিকে মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হয় না। পরিবেশের এ অসামাজিক অস্থিরতা, ভাষা ও আচরণরে এ অপ্রকৃতিস্থ বিশৃংখলতা চরিত্রাধারে নানাভাবেই সমগ্র গল্প জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

গল্পের ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'*** নামকরণটির মধ্যে দিয়ে একাধারে দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা অসহায় মানুষগুলির অবসন্নতা, বিপর্যস্ততা ও বিপন্নতা প্রতিফলিত হয়েছে। একদিকে দেশভাগের ফলে হারিয়ে ফেলা জীবনের প্রতি ভালোবাসা ও মোহগ্রস্থতা এদের মনে যেমন স্মৃতির পাখা মেলে উড়ে আসে, বর্তমানের কঠিন সময়ের তুলনায় বিচার করার প্রয়াস করে তাকে, কখনও অতীতের স্বপ্ন-সাধ্য সময় পেরিয়ে আবারও ডানা মেলতে চায় তারা—আর অন্যদিকে, এক লহমায় গড়ে ওঠা পরিবর্তিত জীবনে, উত্তর কলকাতা অথবা শহরতলীর কলোনির বিষাক্ত পরিবেশে, রাজনৈতিক অঙ্গুলীহেলনে চালিত এদের ***'ক্রাইম এফেক্টেড লাইফ'***, বারংবার চাওয়া সুবিচারের প্রত্যাখ্যানজনিত অপরিসীম অসহায়তা, অসহনীয় ব্যর্থতা, ঘৃণ্য নতুন পরিস্থিতিতে না মানাতে পারার অস্থির আকুলতা—ক্রমে ক্লান্তি আর হতাশার কঠিন বাষ্প ঘনিয়ে তোলে এদের প্রতিদিনকার সমস্যাসংকুল জীবনে—যাকেও ধোঁয়া ও ধুলিদীর্ণ দুষিত পরিবেশের সাথে তুলনা করা যায়। আগের জীবনের সাথে পরের জীবনকে না মেলাতে পারার অক্ষমতা, দুর্বৃত্তায়নের বক্ররৈখিক রাজনীতি-চক্রে বাধ্য হয়ে পিষ্ট হয়ে যাওয়া জীবন আর ইচ্ছে-খুশী মতো রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া কিম্বা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মতো স্বাভাবিক জীবন বিরুদ্ধ কাজের নিত্যতা এদের দিনে দিনে আরো বেশী ক্লান্ত ও নিস্পৃহ করে তোলে, অসামঞ্জস্যের সাথে মানিয়ে না নিতে পারার দুরারোগ্য মানসিক অসুখে ভুগে চলে তারা। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র রতনের মধ্যে দিয়ে এ সকল ভাবচিত্রেরই সন্ধান মেলে। কিন্তু কোনো না কোনো সময়ে অবসন্ন এই মানুষগুলিই রতনের মতো গর্জে ওঠে প্রতিবাদে। অন্যদিকে তাদের একঘেঁয়ে, অবসন্ন, বিষাদগ্রস্থ ও প্রতিকারহীন জীবনে দেশভাগপূর্ব জীবনের সুখ-স্বপ্ন-কল্পনারা বারে বারে উকি অথবা হাতছানি দিয়ে যায়। ***'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'*** নামের প্রথম দুটি শব্দ অর্থাৎ ***'ধোঁয়া'*** এবং ***'ধুলো'*** যদি গল্পের কলোনি জীবনের সমস্যাসংকুলতা ও বিপন্ন বাস্তবকে ইঙ্গিতবহ করে তোলে তবে শেষের শব্দ ***'নক্ষত্র'*** অবশ্যই সেই সুদূর-কল্পনাচারী আশা যা তাদের এখনও স্বপ্ন দেখায়, বেঁচে থাকার আশা যোগায়। তবু বাস্তব পৃথিবীর দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতিরূপ এই ধোঁয়া-ধূলি-মলিন আকীর্ণতা তাদের জীবনে সুদূরের সেই অধরা নক্ষত্রের আলোরূপী আশাকে ঢেকে দেয়। তাদের জীবনে কবে সে আলো পৌঁছুবে তা তারা বুঝতে পারে না। তাই বাড়ে ক্ষোভ, হতাশা আর নিরুপায়তা। তবুও বলবো, ***'নক্ষত্র'*** শব্দটির উপস্থিতি এ গল্পের নামকরণে এক উজ্জ্বল আশাবাদের সঞ্চার করেছে ও তা গল্পটিকে অধিকতর ব্যঞ্জনাবহ করে তুলেছে।

'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পের ভাষা-প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রথমেই গল্পকারের নিজের বক্তব্য প্রসঙ্গে আসা যায়। গল্পকারের নিজের ভাষায়ঃ ***'গল্পের ভাষা বোধ হয় যত নিরাভরণ, কম কাব্যগন্ধী হয় ততই তা বর্তমানের জটিল বাস্তবকে ধরার পক্ষে উপযুক্ত। অনেক সময় ভাষার এক্সপেরিমেন্টের খেলায় সত্য তলিয়ে যায়; ম্যানারিজমের কুহকে চরিত্রের অবয়ব অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। আর সত্যকে ধরার প্রাণপন চেষ্টাই তো লেখকের আত্মবিকাশের একমাত্র পথ।'***[২৯] লেখকের ***'অনি'*** বা ***'শ্রেণীশত্রু'*** গল্পের মধ্যে দিয়ে আত্মোপলব্ধি তথা আত্মবিকাশের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল আলোচ্য গল্পেও তার প্রভাব পড়েছে। বস্তুতঃই যুগের এক প্রকৃত সত্যকে তুল ধরার চেষ্টা এ গল্পের সামগ্রিক লক্ষণ হয়ে উঠেছে। সে হিসাবে গল্পের ভাষাও যুগচিহ্নবাহী এবং সময়োচিত। এ গল্পে দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ফেলুর মার কথায় পূর্ববঙ্গের উপভাষাগত প্রভাবটি চোখে পড়ে। ফেলুর মা'র কথায়ঃ ***'আমার রক্ত যদি তর গায়ে থাকে তবে উয়ারে মার এহনই। কি! ভিরমি খাইয়া পড়লি? যা, দৌড়া।'***[৩০] কিম্বাঃ ***'তুই মাইয়ালোক। তুই পারস ফেলুর মতো বাড়ি বানাইতে?'***[৩১] এই প্রজন্মের রতন পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার প্রভাব-মুক্ত। পুলিশের বড়বাবু অজিত দাসের চরিত্র বর্ণনা ও চরিত্রের ভাষায় ব্যঙ্গের চাতুর্য ও ভাষার মারপ্যাঁচ লক্ষ্য করা যায়। চরিত্রের উপযোগী এ ভাষার উদাহরণঃ ***'চারমিনার সিগারেট ধরান বড়বাবু। রতনের দিকে খোলা প্যাকেটটা ঠেলে দিয়ে বলেন, 'তুমি ভালো***

লোক। তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে তো কোনো গণ্ডগোল নেই বাবা। তুমি এর মধ্যে আস'ছ কেন কাল ইস্কুল বন্ধ?' নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে বললেন।' [৩২] ছোট ছোট তির্যক বাক্য ও অর্থবহ শব্দবন্ধে কথা বলেছে অজিত দাস। রাজনৈতিক নেতা অধীর চ্যাটার্জীর কথায় নাটকীয় আবেগ লক্ষ্য করা যায়। পলিটিক্যাল নেতাদের কথা বলার স্টাইলটি তার এ আচরণের সঙ্গে মানানসই। স্টিরিও টাইপ এই চরিত্রটির বর্ণনায় নেতা-সুলভ অন্যান্য ধরন-ধারনের পাশাপাশি অভব্য শব্দ ব্যবহারের অনায়াস ও অভ্যস্ত স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। সে বলেঃ *'কাগজে আমি পেচ্ছাপ করি। আমাকে এত রাতে উত্তেজিত কোরো না রতন।'* [৩৩] তথাকথিত বামপন্থী নেতাদের কায়দা-কেতা মতো অধীর চ্যাটার্জীর সংলাপেও কথায় কথায় *'রাশিয়া'*, *'চীন'* প্রসঙ্গ, 'এসেমব্লি', *'ময়দান'*, *'মিটিং'* কিম্বা *'সশস্ত্র বিপ্লব'* এর মতো বাঁধাধরা শব্দবন্ধ বেরিয়ে এসেছে। তবে জীবন সত্যের বাহক হিসাবে তার বলা যে কথাটি রতন সহ পাঠকদের মনকে আলোড়িত করে তোলে তা হলোঃ *'যেদিন লোকের চেতনা আরও বাড়বে, সেদিন আর বেণুকে কোনো দরকার হবে না।'* [৩৪] দেশভাগের ফলে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসা ও শিয়ালদা স্টেশনে ভিড় জমানো নারকীয় পরিবেশে কোনো এক উদ্বাস্তু বৃদ্ধের চেঁচিয়ে বলাঃ *'ও মাগী আমার মেয়ে না'* বাক্যটি যেভাবে গল্পে উঠে এসেছে তাতে এই আশ্রয়হারা মানুষগুলির অসহায় বিপন্নতা যে তাদের ভাষাগত বিপর্যয় তথা বেলাগাম অশ্লীলতার জন্যও দায়ী তা আর অস্বীকার করার উপায় থাকে না।

গল্পকারের ভাষায় 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র' গল্পের শেষের বর্ণনাটি এরূপঃ *'রতন আবার মুখ নিচু করে। আলগোছে পায়ের দিকে হাত বাড়ায়। কাঠের বাঁট শক্ত করে চেপে ধরে। বেণু কিন্তু হাসি থামায় নি। এখনো সে হাসছে। রতন সেই হাসির দিকে তার সমস্ত শরীরটা ছুঁড়ে দেয়।'* [৩৫] এ বর্ণনায় রতনের আবেগ, অনুভূতি, প্রতিশোধ স্পৃহার পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী বেণুর পাশবিক বহিঃপ্রকাশটি বাস্তব ও শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম বার মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকার মধ্যে দিয়ে যেমন একদিকে নিহত ও নিথর ফেলুর দেহের প্রতি রতনের নিবিষ্টতা সম্মোহিতের ন্যায় ফুটে উঠেছে তেমনই দ্বিতীয় বার মাথা নিচু করে পায়ের কাছে রাখা অস্ত্র তুলে নেবার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে প্রতিদ্বন্দ্বী বেণুকে প্রত্যাঘাত ফিরিয়ে দেবার মতো মানসিক প্রস্তুতি ও দৃঢ়তা। বেণুর মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে রতন শেষপর্যন্ত পেরে উঠবে কি না তা মনে সন্দেহ জাগায় কিন্তু *'রতন সেই হাসির দিকে তার সমস্ত শরীরটা ছুঁড়ে দেয়'* এ জাতীয় বাক্যে দৈহিক শক্তির পাশাপাশি অনবদ্য মনোবলের ইঙ্গিতটিও প্রাধান্য পেয়ে যায়। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে রতনের আক্রমনাত্মক লড়াই-এর প্রবণতা, ভয়হীনতা ও সাহসিকতাকে প্রকাশ করে তোলে গল্পের এই অন্তিম ব্যঞ্জনাটি। রতনের দৈহিক শক্তি তথা কব্জির জোর যে অসামান্য তা গল্পের মাঝে বলা ফেলুর কথাতেই জানা যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রতন আইনকে প্রথমেই তার নিজের হাতে তুলে নিতে চায় নি। বারংবার ব্যর্থ রতন তার হতাশ্বাস রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে থেকে যখন আর কোনো ইতিবাচক সমাধানের রাস্তা খুঁজে পায় না, তখনই সে অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্য এই একক রাস্তাকে বেছে নেয়। তবে গল্পে রতনের সমস্যা ও তার প্রতিবাদ অন্য অর্থে একক নয়, বরং গল্পের অন্তিম ব্যঞ্জনায় এসে তা সমকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণ ও নকশাল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও সমষ্টির একটি অন্যতম মূল ভাবনায় চিহ্নিত হয়ে যায়। ফলে, শেষপর্যন্ত গল্পের এ অন্তিম ব্যঞ্জনাটি সমাজ ও সমষ্টির জেগে ওঠার সেই সংকেত ও দ্যোতনাকেই বহন করে চলে যার প্রাসঙ্গিকতা হয়তো আজও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। যদিও সামাজিক ও আইনী অনুশাসন অনুযায়ী রতনের এ আচরণ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। গল্পের ক্লাইম্যাক্স বা অন্তিম ব্যঞ্জনাটি প্রসঙ্গে আরো বিশ্লেষণে যাবার আগে লেখক অসীম রায়ের নিজের একটি উদ্ধৃতির প্রসঙ্গ টানা যেতে পারে। তিনি বলেনঃ *'গল্প সম্পর্কে আমার মধ্যে একটা স্ববিরোধ ছলি। গল্প যেন একশো মিটার দৌড়। আমি চাই নিরবচ্ছিন্ন ম্যারাথন যার আধার উপন্যাস। কিন্তু এই স্ববিরোধের চেহারা ছিল জটিল কারণ স্কুলের প্রাইজ পাওয়া তিনখণ্ড গল্পগুচ্ছের আমি প্রকাণ্ড ভক্ত; চেকভ আমায় আলোড়িত করে। যে সব গল্প একটা চমকপ্রদ ক্লাইম্যাক্সের মোচড়ে শেষ হয়—যেমন মোপাসাঁর গল্প, তা আমাকে টানতো না।'* [৩৬] একসময় সমগ্র বিশ্বে চেখভের গল্প-উপন্যাসগুলো থেকে একটি পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়, যা পরে *'চেকভ'স গান'* নামে পরিচিত হয়। ইলিয়া গারল্যান্ডের একটি কথোপকথন থেকে এ প্রসঙ্গে এটাও উল্লেখ্য যে, *'যদি নাটকের কোনো অঙ্কে একটি বন্দুককে দেয়ালে ঝুলতে দেখতে পাও, তাহলে নাটকের শেষ অঙ্কে অবশ্যই এটি*

গুলিবর্ষণ করবে।'[৩৭] তৎসহ চেকভের গল্পের আঙ্গিকের ব্যবহারেও আছে '**স্ট্রিম অব কনশাসনেস**' বা 'বিরতিহীন চৈতন্যপ্রসূত অভিজ্ঞতা'। 'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ' শিরোণাম-গ্রন্থে প্রখ্যাত ছোট-গল্প সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তো বলেইছেনঃ ***'চেকভের গল্পে বর্ষাসন্ধ্যার কোমল বিষণ্ণতা, যা তাঁর অধিকাংশ গল্পেরই বৈশিষ্ট্য।'***[৩৮] তবুও চেকভের গল্পে মোপাসাঁর গল্পের মতো কোনো 'হুইপ ক্র্যাক এণ্ডিং' নেই, আর আলোচ্য 'ধোঁয়া ধূলো নক্ষত্র' গল্পের অন্তিম অনুরণনে পাঠক-মনে সেই 'হুইপ ক্র্যাক এণ্ডিং' সুলভ ব্যঞ্জনাটিই অনুভূত হয়। সেদিক থেকে আমার মনে হয়, আলোচ্য 'ধোঁয়া ধূলো নক্ষত্র' গল্পটি চেকভের তুলনায় অনেক বেশী মোপাসাঁ সুলভ।

লেখক অসীম রায় নিজে একসময় বলেছিলেনঃ ***'আমার অনেক সময় মনে হয়েছে আমি ঠিক টিপিক্যাল বাঙালি লেখক নই। যার কাছে পাঠকের মনোরঞ্জনই প্রধান চালিকা-শক্তি।'***[৩৯] বস্তুতঃ অসীম রায়ের গল্প সামাজিক দায়বদ্ধতার সাথে সাথে বুদ্ধিবৃত্তির এক অনন্য সংযোজন। তাঁর চারপাশের চলমান জগৎ জীবন্ত হয়ে ওঠে তাঁর ***'আরম্ভের রাত'***, ***'শ্রেণিশত্রু'***, 'অনি', ***'প্রতিপক্ষ'*** প্রভৃতি গল্পের মধ্যে দিয়ে। তাঁর নিজের কথায়ঃ ***'আমি চাই আমার গল্পের নিঃশ্বাস যেন পাঠকের গায়ে এসে লাগে।'***[৪০] তাই হয়তো তাঁর ***'শ্রেণীশত্রু'*** গল্পটি পড়তে গিয়ে হিরণকুমার সান্যালের মনে হয়ঃ ***'পড়তে পড়তে গা ছমছম করে।'***[৪১] সেইসঙ্গে তাঁর রচনায় জেগে ওঠে লেখকের সেই প্রগাঢ় আত্মোপলব্ধি যাকে কখনই তথাকথিত বাণিজ্যিক শিল্পকলার বিচারে বিশ্লেষণ করা যায় না। শেষ কথা হিসেবে তাই তাঁরই ভাষানুসরনে বলা যায় যে, মানুষের সংবেদনশীলতাকে যা প্রখর করে তোলে সেই ***'ইউটোপিয়া'***, মুক্ত চিন্তাকে প্রতিষ্ঠা করার সেই শ্রমসাধ্য উপলব্ধিই সাহিত্যের জগতে তাঁকে এক কালজয়ী লেখক করে তুলেছে।

পাদটীকাঃ

১. **'লেখকের জবানবন্দী', 'অসীম রায় গল্পসমগ্র',** পৃঃ ১০
২. তদেব, পৃঃ ১২
৩. **'অসীম রায় গল্পসমগ্র', 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'** দ্রষ্টব্য, **পৃঃ** ৩৮
৪. তদেব, পৃঃ ৩৮
৫. তদেব, পৃঃ ৪২
৬. তদেব, পৃঃ ৪৫
৭. তদেব, পৃঃ ৪৬
৮. **'গল্প কেন', 'অসীম রায় গল্পসমগ্র',** পৃঃ ১৪
৯. **'অসীম রায় গল্পসমগ্র', 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'** দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৮
১০. তদেব, পৃঃ ৩৯
১১. তদেব, পৃঃ ৪২
১২. তদেব, পৃঃ ৪৫
১৩. তদেব, পৃঃ ৩৯
১৪. **'গল্প কেন', 'অসীম রায় গল্পসমগ্র',** পৃঃ ১৪
১৫. **'অসীম রায় গল্পসমগ্র', 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'** দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৮
১৬. তদেব, পৃঃ ৩৯
১৭. তদেব, পৃঃ ৪০
১৮. তদেব, পৃঃ ৪২
১৯. তদেব, পৃঃ ৪৫
২০. **'অসীম রায় গল্পসমগ্র', 'আরম্ভের রাত'** দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৩

২২. **'অসীম রায় গল্পসমগ্র', 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'** দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৪২
২৩. তদেব, পৃঃ ৪৪
২৪. তদেব, পৃঃ ৪৫
২৫. তদেব, পৃঃ ৪৫
২৬. তদেব, পৃঃ ৩৮
২৭. তদেব, পৃঃ ৪৩
২৮. তদেব, পৃঃ ৪৫
২৯. **'গল্প কেন', 'অসীম রায় গল্পসমগ্র',** পৃঃ ১৬
৩০. **'অসীম রায় গল্পসমগ্র', 'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'** দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩৮
৩১. তদেব, পৃঃ ৩৯
৩২. তদেব, পৃঃ ৪১
৩৩. তদেব, পৃঃ ৪৪
৩৪. তদেব, পৃঃ ৪৫
৩৫. তদেব, পৃঃ ৪৬
৩৬. **'প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশের কথামুখ', 'অসীম রায় গল্পসমগ্র',** পৃঃ ১৮
৩৭. 'সাহিত্যজীবনের সন্ধিক্ষণে', আন্তন চেকভ, উইকিপিডিয়া দ্রষ্টব্য
৩৮. **'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৫১**
৩৯. **'গল্প কেন', 'অসীম রায় গল্পসমগ্র',** পৃঃ ১৫
৪০. তদেব, পৃঃ ১৬
৪১. তদেব, পৃঃ ১৬

গ্রন্থ ও ওয়েবসাইট ঋণঃ

১. অসীম রায় গল্পসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, আগস্ট ২০১৭
২. **'কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ',** নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ২০১৫
৩. https://bn.wikipedia.org/wiki/আন্তন চেকভ